ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 511-517
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.238

অনিতা অগ্নিহোত্রীর নির্বাচিত ছোটগল্পে নারী: অন্য আলোকে

মঞ্জুশ্রী মুর্মু, *বাংলা বিভাগ, গবেষক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.01.2026; Accepted: 28.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Anita Agnihotri was one of the brightest figures in Bengali literature, who established a unique literary paradigm. In her fiction, women walk alongside men, guided by their own consciousness and agency. The roles of daughter, wife, and mother are revealed within the framework of lived reality. Alongside traditional portrayals of women, this paper also presents a multifaceted depiction of women's everyday lives.

Keywords: Womens, Psychology, Fiction, Child Labour, Literature

কথাসাহিত্যিক অনিতা অগ্নিহোত্রীর কথনবিশ্বে বিশ্বায়ন, অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক সংকট, বিচ্ছিন্নতাবোধ, স্বদেশ, প্রকৃতি যেমন রূপায়িত হয়েছে ঠিক তেমনি উদ্ভাসিত হয়েছে নারী-পুরুষের সম্পর্কের গহীনবিশ্ব। দাম্পত্য প্রেম, নারীর ক্ষমতায়ন, সংগ্রাম চেতনা, সম্পর্কের অবনমন, সত্ত্বার ভাঙাগড়া, শোষণ-যন্ত্রণা, জটিল মনস্তত্ত্ব, তাঁর কলমে অন্য মাত্রা দান করেছে। তাঁর কলমে নারীর বহুমাত্রিক রূপ পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। নারীর চিরাচরিত রূপ অর্থাৎ জননী-কন্যা-জায়া-র প্রত্যেকটি রূপ বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে তাঁর কথনবিশ্বে। আখ্যানের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত নারীকেন্দ্রিক এক অসীম সক্রিয়তার বীজ ব্যাপ্ত। অবদমন থেকে উত্তরণ নারীর এই সুর তাঁর আখ্যানবিশ্বের প্রতিটি পর্বে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কথাকার অনিতা অগ্নিহোত্রীর ছোটগল্প সেই ভাবনারই নামান্তর। তাঁর বিভিন্ন গল্পে বাল্য নারীর নানান স্বর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সময়ের বাঁকে বাঁকে বয়ে চলা হাজারো সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্খা, নৈরাশ্য জীবন চেতনার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর নারীর কণ্ঠে। রিয়েলিস্টিক ভাবনাগুলিকে ম্যাজিক রিয়েলিজমের প্রকরণে এমনভাবে গেঁথে দিয়েছেন যা পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে।

'উষ্মকোঠি' গল্পটিতে পুবি নামের এক অসহায় মেয়ের পারিবারিক অভাব অনটনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় মায়ের উপর অভিমান করে এঁটো হাতেই পুবি নদীর দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। অভিমানের কারণ হিসেবে দেখা যায় মা বেঁচে যাওয়া বাসি ভাতটা তাকে না দিয়ে বোন শীতলীকে দিয়েছে, অথচ মা জানে যে বোনের চেয়ে পুবির খিদে অত্যন্ত বেশি। রাগে, অভিমানে, লজ্জায় নদীতে ঝাপ দেয় পুবি। মরতে অবশ্য নয়, কারন ডুবে পুবির মৃত্যু নেই একথা তাঁর জানা ছিল। অভিমানের চোখের জল নদীর জলে মেশানোই তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য। কিশোরী পুবি মনে মনে কল্পনা করে-

> "মস্ত পেতলের হাড়িতে ভাত রাঁধবে পুবি, যেমন হাড়ি দাসেদের হেঁসেলে, ঘি দিয়ে ফোড়ন দেবে মটরের ডালে, আর হ্যাঁ..... বড় বড় চিংড়ি, ইলিশ মাছের পেটি ভাজা..... দশটা ছেলেপুলেও যদি থাকে, খাবার কম পড়বে না কারো ভাগে।"[১]

কল্পনাটির মধ্য দিয়ে পুবির মনের এক অদ্ভুত সরলতার দিক ফুটে উঠেছে। যেখানে অন্য মানুষদের চাওয়া পাওয়ার সীমা-পরিসীমা নেই, সেখানে পুবির মতো মেয়ের এক সাধারণ জীবনযাপনের চিন্তা। দাস বাবুদের মহুরি বসন্ত ছেলেটা মুড়ি আর চপ সবাইকে দিল কিন্তু পুবিকে দিল সকলের চেয়ে বেশি। সরলা পুবি প্রথমে বিষয়টাকে সাধারণভাবে নিলেও পরে যখন সে বুঝতে পারল বসন্তের হাতটা তাঁর পিঠের উপর, বসন্তের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পুবির বাকি থাকে না। পুবি বুঝতে পেরেছে তাঁর খিদের সঙ্গে বসন্তের থাবাটার একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কিছু পরিমাণ খাবারের জন্য পুবির মতো না জানি কত মেয়েকে প্রতিনিয়ত অপমান, লজ্জার সম্মুখীন হতে হয়। পুবি জীবিকার তাগিদে স্কুল বন্ধ করে সুতোকাটার মজুরি বৃত্তি করে। সকাল দশটা থেকে বিকেল পাচটা পর্যন্ত কাজ করে সে হাতে পয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা মজুরি পায়। সপ্তাহের শেষে মজুরির খুবই সামান্য টাকা নিজের কাছে রেখে পুরোটা দিয়ে দেয় মাকে। কাজের জায়গাতেও নানান ব্যঙ্গ বিদ্রুপের শিকার তাকে হতে হয়—

> "ভাতে টান পড়বে কেন- ভাতে টান পড়ার তো কথা না- এখন যদি বুনো বাগদি চামারদের মেয়ে- বউরাও সুতো কাটতে লেগে যায়।"[২]

প্রথম প্রথম সরলা প্রকৃতির পুবি না বুঝলেও পরবর্তী সময়ে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পেরেছে কথাগুলো তাকে কেন্দ্র করেই বলা হয়েছে। পুবির বাবা ভিন্ন রাজ্যে ইট ভাটার শ্রমিক। অনেক শ্রমিক বউবাচ্চাদের সঙ্গে নিলেও পুবির বাবা তাদের নিয়ে যায়নি, সেখানে বড় কষ্ট। সেখানে বাচ্চারা নরম আঙুলে ছাঁচ থেকে ইট বের করে, মেয়েরা ছাঁচ গড়ে, পুরুষরা ভাটিতে ইট পোড়ায়। কাজের একটু এদিক-ওদিক হলে মার খায় লোকগুলো। বউদের নিয়ে খাটাখাটি হয় রাত্রে। সেখানে ছাগল-ভেড়ার মতোন গাদা গাদির জীবন। নিজেদের অনিশ্চয়তা, বাবার প্রাণের অনিশ্চয়তা এই ভাবেই দিন গত হতে থাকে পুবির মতো সাধারণ মেয়েদের। পরদিন ভোররাত্রে অসহ্য খিদের যন্ত্রনায় পুবির ঘুম ভাঙলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জীবিকার তাগিদে পুনরায় যেতে হয় কারখানায়। কিন্তু কারখানা বন্ধ। এদিক ওদিক ঘুরে পুবি এক বৃদ্ধ মুন্ডা চাষির কাছে উপস্থিত হয়ে চাষের বিষয়ে প্রশ্ন করলে তাঁর উত্তর শোনামাত্র পুবির বুকটা ছমছম করে ওঠে। কারন সেখানে হচ্ছে "উম্মোকোঠি"। এক মরণ যজ্ঞির ব্যবস্থা। ট্রে-র উপর হাজার হাজার শুয়ে থাকা গুটি আর তাদের ভিতরে পৃথিবীর আলো দেখার জন্য ঘুমিয়ে থাকা নধর কালো কুচকুচে ডানা গোটানো মথরা। তারা কোনো দিন ওই রেশম গুটির শক্ত দেয়াল থেকে বেরোবে না। দাসবাবুর মতো লোকেরা ওদের বেরোতে দেবে না। কারন গুটি ফুটো করে মথরা বেড়িয়ে গেলে সেই সুতো আর কাজে লাগবে না। তা দিয়ে সরু রেশম সুতো বোনা যায় না। পুবির এই মথগুলির সাথে নিজেদের জীবনের মিল খুঁজে পেয়েছে। এই মথগুলোর মতোই তারাও একটা করে রাত পেরোনোর স্বপ্ন দেখে আর ওটাকেই ভাবে জীবন। পুবি কোথাও যেন এটা অনুভব করতে পেরেছে দাসবাবুর মতো মানুষরা পুবিদের মতো অসহায় দরিদ্র মানুষদের কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই মথ গুলোতে পরিণত করেছে। শেষে পুবির মনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি ভ্যান রিকশায় ইটের যোগান দেওয়া বসন্তকে তীব্র ঘৃনা বিদ্বেষের পরিবর্তে তার প্রতি মায়া জাগে। কোথায় যেন পুবি বুঝতে পেরেছে ওই মথ গুলোর মতোই বসন্তেরও জীবন। সমাজের শাসক স্তরের মানুষেরা শোষিত শ্রেণির মানুষদের জীবন মথেদের জীবনে পরিণত করেছেন।

অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখা গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ট গল্প 'বলকার ভালো দিন'। গল্পটির মূল বিষয় শহরের রাস্তা ফুটপাতে থাকা এক অসহায় শিশুকন্যা বলকার নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় বলকা মিষ্টির দোকানের লুচি ও বাসি ডাল খেয়ে বেশ খুশি এবং মনের মধ্যে চলছে সারাটা দিনের হিসেব নিকেশ। সকালে সজিওয়ালার দোকানে কাজ পেয়ে বলকার খুশির অন্ত থাকে না। কারণ সেখান থেকে হয়তো কিছু পারিশ্রমিক পাবে যা দিয়ে তাঁর এক বেলার খাবারের যোগান হবে। কিন্তু পরক্ষনেই বলকাকে লোকটির কাছ থেকে শুনতে হয়েছে শাসানি - "বেইমানি করেগা তো পিটাই করে গা।"[৩]

আসলে বলকার মতো অসহায় শিশুদের অবস্থা এইরকমই। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর লোকটি ফিরে এসে টাকার বদলে ফুলকপি দিতে চাইলে বলকা রাজি হয়নি। কিছু দিন যাবৎ বলকার মা নিখোঁজ সুতরাং ফুলকপি নিয়ে বলকার কাজ নেই। অনেক আগে বলকা মাকে মাঝে মধ্যে রাধতে দেখেছে। কড়াই পেতে, ইটের উপর কাঠকুটো দিয়ে কোনদিন চার পাঁচটা আলু কোনোদিন পোকাধরা চাল বলকা মায়ের কাছে বসেছে খেয়েওছে। সকালে ঘুম ভেঙ্গে মাথার কাছে রাস্তার ঠেকুয়া কিংবা শক্ত বিস্কুট পেয়েছে, বলকার মা রেখে দিয়েছে তাঁর জন্য। রাস্তার ইদুর অথবা ভোরের কাক টান না মারলে বলকার পেটে গেছে সেসব খাবার। অবিভাবকহীন বলকাকে বস্তির অন্য সব বাচ্চাগুলো পাগলি পাগলি বলে, বলকাকে অকারণে ধাওয়া করে ঢিল মেরে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ। শুনতে হয়েছে— "বলে, যা তোর বাপকে ডেকে আন।"[৪] কিন্তু বলকা কথাগুলো গায়ে মাখে না। কারণ সে জানেই না তাঁর বাবা কে? বাপকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তাঁর নেই বরং উৎসাহের সহিত খাবার জোগাতেই বলকা ব্যস্ত। আসলে বলকার মতো অসহায় শিশুদের খাদ্য থেকে বাসস্থান সবকিছু নিজেকেই যোগাড় করে নিতে হয়। মিষ্টির দোকানের কাজ থেকে চায়ের দোকানের কাজ নিজেকেই করে নিতে হয়। বারো আনার ছাতুর বদলে আটার রুটি অমৃতের মতন দামী বলকার মতো অসহায় বাচ্চাদের কাছে। কালীবুড়োর একমাত্র সঙ্গী এই বলকা। রাগ অভিমান করে ছেলের কাছ থেকে চলে এসেছে বুড়ো। হাত গণনার কাজ করে। মামলা মোকদ্দমা জর্জরিত চাষি মজুরাই হল বুড়োর উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম। খড়ি চক দিয়ে রাস্তার ছক কেটে রাখে বুড়ো তা দেখে বলকা ছক আঁকলে বুড়োর রাগের অন্ত থাকে না। রেগে বলে- "গ্রহ নক্ষন নিয়ে খেলা। মরবি তুই, ট্রাম-বাস চাপা পড়ে মরবি।" মন ভালো থাকলে আবার অন্যরকম এই অসহায় মানুষটি। শিশুসুলভ মননের পরিচয় পাই বলাকার মধ্যে। বাবাকে নিয়ে মিষ্টি কিনতে আসা সেই ছোট্ট খুকুটার লুকোচুরি খেলা, অকারণ কান্না, তার মনে দাগ কেটে যায়। খুকুটি চলে যাবার পর অদ্ভুত এক অনুভূতি কাজ করে তাঁর মধ্যে। যেন কিছু একটা ছিঁড়ে আলাদা হয়ে গেল ওর ভিতর থেকে। একটি শিশু স্নেহ, ভালবাসার দাবীদার যা বলকা কোনোদিন কোথাও পায়নি, পেয়েছে তাচ্ছিল্য। খুকুর মধ্য দিয়ে কোথায় যেন সেই অনুভূতিরই সাড়া জেগে ছিল বলকার মনে। কিছু দিন পরে কোথা থেকে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে এল তাঁর পাগল মা। অনেক কষ্ট করে হাঁটত, একপাশ হয়ে ঘুমোত। বলকা অদ্ভুত এক গোঙানি শুনতে পেয়েছিল একদিন রাতে। প্রথমটা সে স্বপ্ন ভেবে এড়িয়ে গেলেও সকালে তাঁর হাত ভিজেছিল রক্তে। পথ চলতি রাস্তার ফুটপাতের উপর নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচারের শিকার তাঁর পাগলি মা। বলকার বুঝতে বাকি ছিল না সেদিন রাত্রের গোঙানির মূল কারণটা। মা নিজে যায়নি, কেউ টেনে নিয়ে গিয়েছিল। গাড়ি বারান্দার ফলওয়ালা তাদের কম্বল দিলে মা নিতে বারণ করে— "ফেরত দে। লোকটা বজ্জাত। ছিড়ে খাবে তোকে।"[৫] বলকা ভয়ে নেয়নি কম্বলটা কিন্তু তবুও তাঁর মা রক্ষা পায়নি। "মাকে কে কোথায় টেনে নিয়ে গেছে, কে জানে! ছিড়ে খুঁড়ে রান্না করে খাবে কুকুরা মিলে।"[৬] মানুষরূপী পশুরা সমাজের আনাচে, কানাচে অবস্থান করছে। যার শিকার হতে হয়েছে বলকার মায়ের মতো ভারসাম্যহীন নারীদের। যার অনেকটাই প্রভাবিত করেছে বলকার মতো অসহায় শিশুদের জীবন। তবুও বলকার মতো অজস্র শিশুদের

বাঁচতে হয়। দিন বদলাবে না জেনেও বলকারা মনটাকে ভালো করে নেয়। তাঁরা আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখে বেঁচে থাকার।

'ভাগ্যিমানির ছবি' গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র ভাগ্যি একটি ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে। ভাগ্যি তাঁর দিদার সঙ্গে মাসির বাড়িতে থাকে। গল্পের শুরুতেই মেসো ভাগ্যিমানিকে বলেছে— "কাল তোর মা আসছে রে..."[৭]

মেসোর এই কথা শুনে ভাগ্যির আনন্দের সীমা ছিল না। ভাগ্যির রেজাল্ট বেরিয়েছে, রিপোর্ট কার্ড এসেছে, নতুন ক্লাসে উত্তীর্ণ হয়েছে। ড্রইংয়েও ভাগ্যি ফাস্ট হয়েছে। অনাথ ভাগ্যি রেজাল্টের কথা মাসিকে জানালে মাসি তেমন কোন উৎসাহ দেখায় না। আসলে মাসি মেসোর অভাবের সংসারে ভাগ্যি ও দিদা অপ্রয়োজনীয় বস্তুর মতো। ভাগ্যির মতো অসহায় বাচ্চারা একটু ডাল ও ডিমসেদ্ধতেই সন্তুষ্ট। দিদা ও ভাগ্যির স্থান খাটের নীচে। ভাগ্যির মায়ের ছেড়ে চলে যাবার খাটের ওপর ও নীচের ব্যবস্থার একটা সম্পর্ক আছে সেটা বুঝতে ভাগ্যির অসুবিধা হয় না। ভাগ্যির ধারণা— "যাদের বাপ-মা আছে, তারা খাটের ওপরে শোয়। যাদের নেই, তাঁরা তলায়। ভাইয়ের মা-বাবা আছে। দিদা আর ভাগ্যির নেই। ভাগ্যির তো থেকেও নেই।"[৮] আসলে ভাগ্যির মতো অসহায় মেয়েরা বাবা-মা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় ভাগ্যের পরিহাসে পিতৃমাতৃহীন। পারিবারিক অশান্তির জেরে ভাগ্যির বাবা ও মা আলাদা হয়ে যায়। এরপর সাড়ে তিন বছরের ভাগ্যিকে নিয়ে মা চলে আসে কোলকাতায় তাঁর দিদার কাছে। তখনই বাবার সঙ্গে ভাগ্যির চিরদিনের সম্পর্কের বাঁধন ছিন্ন হয়ে যায়। বুদ্ধিমতি মা এক বাবুর বাড়িতে কাজ জুটিয়ে নিলেও তা চিরস্থায়ী করতে পারেননি। বাড়ির ড্রাইভারের সাথে অবৈধ সম্পর্কের জেরে সম্মানহানির ভয়ে দিদা সেই লোকটির সাথেই ভাগ্যির মায়ের পুনরায় বিবাহ দেন। ভাগ্যির জীবনের সূচনা হয় এক নতুন অধ্যায়ের। তারপর ভাগ্যি মাঝে মধ্যেই মায়ের কথা মনে করে। কত সুন্দর তাঁর মা, টাইট করে বেনী বাঁধে, ফুলফুল শাড়ি পড়ে, পায়ে সবসময় চপ্পল থাকে। সেই অর্থে মায়ের সান্নিধ্য ভাগ্যির কপালে জোটে না। মায়ের গায়ের একটা গন্ধ আছে যে গন্ধটা আবছাভাবে ভাগ্যির মনে পড়ে। মাসিকে বলছে গোলাপী ফ্রক বের করে দিতে, রিপোর্ট কার্ড, ড্রয়িং খাতা সব গুছিয়ে রেখেছে। সে মনে মনে স্থির করছে মায়ের কাছে গিয়ে সে আর খাটের নীচে শোবে না। মায়ের খবরে মাসি খুশি হলেও দিদা ভাগ্যিকে কাছে না পাওয়ার কষ্টে থমথমে। অন্য দিনের তুলনায় মাসির মনও আজকে নরম হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাগ্যির আশা পূর্নতা পায় না। ভাগ্যির মায়ের পেটে তখন দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান, তাঁর মায়ের আসার কারণ ভাগ্যিকে এক নজরে দেখে তাকে আদর করা ব্যস এইটুকু। মায়ের দ্বিতীয় স্বামীর গৃহে ভাগ্যির কোনো স্থান নেই। আসলে ভাগ্যির মতো অসহায় মেয়েদের কোন জায়গাতেই নিশ্চিন্ত কোন স্থান নেই। না মায়ের কাছে, না বাবার কাছে, না অন্য কোনো স্থানে। স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক অশান্তির কারণে প্রাণময় ভাগ্যির শেষ পর্যন্ত প্রাণহীন নিস্তেজ প্রাণে পরিণতি ঘটে। ভাগ্যির শেষ পরিণতি তাঁর মা দিদার মতো অন্যের বাড়ির পরিচারিকা রূপে। ভাগ্যির ভাগ্য শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে যায় এক অচেনা জগতে।

অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প' গল্পসংকলন বইটির একটি অনবদ্য গল্প হল 'সম্ভবত মুক্তি বিষয়ক' গল্পটি। গল্পটির পটভূমি অঙ্কন করা হয়েছে শহর কলকাতার এক তরুণ দম্পতি সুমন্ত্র ও বুলবুলির দাম্পত্য জীবনের অবসান নিয়ে। আলোচ্য গল্পের প্রথমেই আমরা দেখতে পাই সুমন্ত্র অসময়ে বাড়ি ফিরছে পরবর্তীতে জানা যায় সেদিন ছিল তাঁর আর বুলবুলির ডিভোর্সের দিন। কোর্টে ভাই সুভদ্র এসেছিল তাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাবার জন্য, কিন্তু তাতে সে রাজি হয়নি, কাল পরশু যাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভাইকে বিদায় দিয়ে দেন। তাঁর আর বুলবুলির স্মৃতি জড়ানো বাড়িটাতে সুমন্ত্র একাকীত্ব বোধ করে। আসলে তারা দুজনেই চেয়েছিলেন "ডিভোর্স" নামক মুক্ত জীবনের স্বাদ আস্বাদন করতে। হিসেব মতো সুমন্ত্রের আজকের

দিনে খুশি হওয়ার কথা। গত দেড় বছরে সকলেই তাদের বিবাহিত জীবনের সম্পর্কে অবগত সকলেই চরম পরিণতির জন্য অপেক্ষা করছিল, কিন্তু যখন সে সময় উপস্থিত তখন সুমন্ত্র কেন উচ্চস্বরে বলতে পারছেন না-

"হ্যাঁ এখন আমরা আর একসঙ্গে নেই,
অথবা, ইয়েস, উই আর নট ম্যারেজ এনিমোর.....
অথবা, আমরা আর বিবাহিত নই....."[৯]

এই বিষয় গুলিতে তাকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। সুমন্ত্রের অনুভূতির জায়গাটা কেমন যেন আলাদা হয়ে গেছে। মনের ভিতর একটা অদ্ভুত মানসিক কষ্ট, নিঃসঙ্গতা, যন্ত্রণা অনুভব করে। সুমন্ত্র নিজের পাশাপাশি বুলবুলির প্রতিক্রিয়ার কথাও চিন্তা করেছে। হয়তো সে বলছে-

"বাব্বাঃ, কেস যেন আর শেষ হয় না.....।
অথবা, মাসিমণি, শোনো, আয়্যাম ফ্রি। কী দারুন না.....।
অথবা, কিছুই না বলে চুপ করে থাকবে। পারবে না বুলবুলি?"[১০]

আসলে সুমন্ত্র বুলবুলির মনের অবস্থা জানতে ইচ্ছুক। সে জানতে চায় বুলবুলি ডিভোর্স পেয়ে খুশি, নাকি সেও সুমন্ত্রের মতো বেদনা অনুভব করেছে। এরপর কোনো এক শ্রাবণ মধ্যাহ্নের স্মৃতি। তাঁর মনে আসে সুমন্ত্র ও বুলবুলি পাশাপাশি দাড়িয়ে। পরবর্তীতে দেখা যায় বৃষ্টি নামছে কিন্তু পাশে বুলবুলি নেই। সেই দাড়িয়ে থাকার মধ্যে রয়েছে সুমন্ত্রের আজকের দিনের নিঃসঙ্গতা একাকীত্ব। বুলবুলি তানপুরার মধ্যে সুমন্ত্র তাঁর অস্তিত্ব খুঁজে পায় এবং পরম যত্নের সহিত সেটাকে ডিভানের উপর শুইয়ে রাখে। ভালোবেসে বিয়ে করেছিল সুমন্ত্র ও বুলবুলি। প্রেমের সম্পর্কের পরিণতি দিতে বুলবুলি বাবা ও মায়ের অমতে সুমন্ত্রের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে গিয়ে রেজিস্ট্রি করেছিল। তারপর কিছুদিন তাদের উন্মত্তের মতো ভালোবাসার সাক্ষ্য বহন করেছে তাদের বাড়ির প্রতিটি কোণ। হঠাৎ করেই একদিন কোথায় যেন সবকিছু উবে গেল।

সুমন্ত্র নিজের কাজে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে বুলবুলিকে উপেক্ষা করা থেকে শুরু করে জন্মদিন ভুলে যেতে শুরু করল। অন্যদিকে দীর্ঘদিনের উপেক্ষার ফলে বুলবুলিরও তৈরি হতে লাগলো এক অন্য জগৎ তাঁর স্কুল, গানের ক্লাস, অতীতের বন্ধু উপমন্যু। দুজনেই এক আলাদা আলাদা পৃথিবীতে বাস করতে লাগল। একে অপরের কাছে বড় সংকীর্ণ, স্বার্থপর ও সাধারণ মানুষ হয়ে গেল। এক জ্যোৎস্নার রাতে হঠাৎই তারা পরস্পরকে আবিষ্কার করল স্পর্শ সম্পর্কহীন, বিচ্ছিন্ন অসহায় তাইতো তারা বিবাহ বিচ্ছেদের মতো চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেও পিছুপা হয়নি। একটি ডিভোর্স যখন সংঘটিত হয় তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এক পক্ষকে ভিক্টিম ও এক পক্ষককে ভিলেন হিসেবে দাবি করা হয়। আপাত দৃষ্টিতে দেখতে গেলে এই গল্পে সেই অর্থে দুজনকেই ভিক্টিমের জায়গায় অবস্থান করেছে। সুমন্ত্র তাদের দাম্পত্য জীবন ভবিষ্যৎ সুরক্ষার তাগিদে নিজেকে এতটাই ব্যস্ত করে রাখলেন যে বুলবুলির জন্য তাঁর বিন্দুমাত্র সময় হয়নি এমনকি গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলিতেই তাকে উপেক্ষা করেছে। পরবর্তিকালে বুলবুলি যখন নিজের জগৎ তৈরি করেছে তখন সুমন্ত্রের কোথাও যেন বিষয়টা অসহ্য ঠেকেছে। দুটি মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে দূরত্বের পাহাড়- "তারা যেন দুটি আগুন-লাগা গাছ। একই মৃত্তিকায় দাড়িয়ে পাশাপাশি জ্বলছে।"[১১] সুমন্ত্র ও বুলবুলি একে অপরের থেকে মুক্তি পেয়েছে ঠিকই কিন্তু বাস্তবিক কি মুক্তি পেয়েছে? সে বিষয়ে কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। সামান্য কিছু ভুল বোঝাবুঝি একটি সুন্দর দাম্পত্যের সম্পর্ককে নষ্ট করে দিয়েছে আলোচ্য গল্পটিতে।

দাম্পত্য সম্পর্কের আর এক বৈচিত্র্যময় উপস্থাপন দেখতে পাই 'পিঞ্জর' গল্পটিতে। "পিঞ্জর" অর্থাৎ খাঁচা যেখানে কাউকে বন্দি অবস্থায় রাখা হয়। গল্পের শুরুতে আমরা দেখি আটাত্তর বছরের বৃদ্ধ কেশব তাঁর

পুরনো গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছেন বাড়িটি বিক্রয় করতে। টাকা-পয়সা দেওয়া নেওয়া আগেই হয়ে গেছে, কেবলমাত্র তাঁর কিছু পুরনো জিনিসপত্র ফিরিয়ে নেওয়া এবং ক্রেতাকে চাবিটি হস্তান্তরিত করাই মূল উদ্দেশ্য। বাসে জানালার পাশে বসে কেশবের মনে ভেসে ওঠে তাঁর পুরনো দিনের স্মৃতি। তাঁর প্রথমা স্ত্রী কিশোরী, পনেরো বছরের কিশোরীর কথা। কিশোরী একাধানে যেমন ছিলেন অপরূপা সুন্দরী তেমনই তাঁর মধ্যে ছিল এক আশ্চর্য আকর্ষণ ক্ষমতা। কেশব লম্বা স্বাস্থ্যবান হলেও বসন্তের দাগ ধরা খাঁদা বোচা মুখ কিশোরীর কাছে ফিকে পড়ে যেত বলে কেশবের ধারণা। যেখান থেকে কেশবের মনে জন্ম নেয় নিজের প্রতি হীনমন্যতা এবং কিশোরীর প্রতি সন্দেহ। কিশোরীর সামান্যতম সাজগোজকে কেশব ঈর্ষা করত সন্দেহের চোখে দেখত। বাইরের সবজি বিক্রেতা, প্রতিবেশী, পাড়ার ছেলে ছোকরাদের থেকে শুরু করে নিজের ঘরের ভাইয়েদের আলাপচারিতাকেও কেশব ঈর্ষা করতো। শিশুদের মতো মাঝে মাঝেই রাগে, অভিমানে খাবার না খেয়ে শুয়ে পড়তো। কতবার কিশোরীর প্রতি আঘাত হানার চেষ্টা করেছে কিন্তু ভালোবাসার টানে আবার নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে কেশব। আবার কিশোরী যখন সাধ্য-সাধন করে ভুলিয়ে ভালিয়ে আদর করে খেতে দিয়েছে, বোকা কেশব তখন সমস্ত কিছুই ভুলে গেছে। পরের দিন সমস্ত অভিমান ভুলে হাট থেকে কিশোরীর জন্য এনেছে নতুন শাড়ি, গয়না। কিন্তু সেই শাড়ি গয়না কিশোরীর গায়ে উঠতেই ঈর্ষায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে তাঁর বুকের ভেতরটা। এক অদ্ভুত মানসিক বিকার কাজ করে কেশবের মনের মধ্যে। কোথায় যেন তাঁর মনে জাগছে কিশোরী কেবলমাত্র তাঁর জন্য জেগে উঠুক। সজ্জিত কিশোরীকে সে অন্যের দৃষ্টির গোচর হওয়াটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। ঠিক এই জায়গাটা থেকেই কেশবের হৃদয়ে জন্ম নিয়েছে ঈর্ষা জনিত যন্ত্রণা। কোথায় যেন কেশব নিজের সম্পদ রূপেই জ্ঞাত করেছে কিশোরীকে। একটি দাম্পত্য সম্পর্ক তখনই সুন্দর হয় যখন সেখানে স্বামী স্ত্রী দুজনের মধ্যেই থাকে অটুট বিশ্বাস, পারস্পরিক বিশ্বাসই দাম্পত্য সম্পর্কের ভীত মজবুত করতে সাহায্য করে। কিন্তু যদি সম্পর্কের মধ্যে সন্দেহের বীজ প্রবেশ করে তাহলে সেই সম্পর্কগুলি ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে হতে একটা সময়ে গিয়ে বিশ্বাসেরও বিলুপ্তি ঘটে যায়। তৎকালীন সময়ে গাঁ ঘরের বউদের বাইরে বেড়ানোর চল প্রায় ছিল না বললেই চলে। কিন্তু কিশোরীর বেড়ানোর শখ ছিল ভারী। কেশব সমাজকে উপেক্ষা করে স্ত্রীকে খুশি করতে স্ত্রীর ভালোবাসা উপভোগ করতে শহরে নিয়ে যায় সিনেমা দেখাতে। সিনেমা শেষ করে ট্রেনে ফেরার সময় কিশোরীকে বাদাম খাওয়ানোর কারণ স্বরূপ কেশবের হাতের ঘুষিতে রক্তারক্তি হয়েছিল এক অচেনা যুবকের করুণ মুখ। কেশবের সেই প্রহারের হাত থেকে কিশোরীও রক্ষা পায়নি। সন্দেহের বশে বাড়িতে এসে তাকেও প্রচুর মারধোর করেছিল কেশব। রাগে, লজ্জায়, অভিমানে। অবশেষে কিশোরী চরমতম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিজের আত্মহননের মধ্যে দিয়ে। অন্যদিকে ভিতু কেশব তাঁর দেহটাকে রান্নাঘরের নিচে পুঁতে রেখে কিশোরীর কুলত্যাগের অপবাদ রটিয়ে দিয়েছিল সারা গ্রামে।

> "আমাদের বংশে কেউ থানা পুলিশ করেনি। এত্তেলা দিয়েছি। বউকে পাচ্ছি না, ওকে খুঁজে দিন। থানায় আধমণ চিনি দিয়েছি, ঝাল, মরিচ, আখের গুড়া..... সেকি খোঁজার জন্য, নাকি না খোঁজার জন্য কেশব? কে জানে, কেন?"[১২]

কিশোরীর এই পদক্ষেপ কোথায় যেন কেশবের মনে ভয় এবং আত্মসম্মান বোধ কাজ করেছে। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় মায়ের অনুরোধে কেশব পুনরায় বিবাহ করেছে অন্নপূর্ণাকে। প্রথম পক্ষের স্ত্রী কিশোরীর সঙ্গে তাঁর কোনো সন্তান না থাকলেও পরবর্তীতে সে দুই ছেলে মেয়ের পিতা হয়েছে। দ্বিতীয় স্ত্রী-এর ক্ষেত্রে প্রথম জনের মতো ভালোবাসার তেমন গাঢ়ত্ব কেশব অনুভব করেনি। অন্নপূর্ণাকে বিয়ে করে কেশব নিশ্চিন্ত। পৃথিবীর লোভী চোখ থেকে তাকে বাঁচানোর দায় নেই কেশবের- "কিশোরী তারই রইল, অন্নপূর্ণা তাঁর হইল

না।"[১৩] এরপর বহু বছর কেটে গেছে কেশব এসেছে তাঁর পুরনো বাড়িতে। এর আগে বহুবার বাড়ির নতুন মালিক চিন্তামন বাড়ি হস্তান্তরের তাগিদ জানালেও কেশব কোনো কারণ দেখিয়ে বিষয়টা এড়িয়ে গেছে। আসলে সেই বাড়িতেই ছিল কেশবের প্রাণের প্রিয় কিশোরীর প্রাণহীন শরীর। কুড়ি বছর পর সেই নরকঙ্কালকে নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন কেশব। বাস কনট্রাক্টরের সঙ্গে তর্ক বিতর্কে হেরে গিয়ে সেই বাক্স নিয়ে নেমে শিশির গাছের ছায়ায় বসে হাহাকার করতে থাকে- "খুব চেয়েছিলাম রে, বউ, তোকে, নিজেই জানিনি কত, রং, রক্ত, মাংস, রূপ সব ছিড়ে খুঁড়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল চাইতে চাইতে।"[১৪] লেখিকা 'পিঞ্জর' গল্পের মধ্য দিয়ে দাম্পত্য সম্পর্কের, প্রেম, সন্দেহ, মানসিক বিকারের ফলে চরম পরিণতি মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলি উদঘাটন করেছেন।

কথাকার পরিবর্তমান সময়ের পারিবারিক জীবনে নারী-পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক সংকটগুলি ধরতে পেরেছিলেন অবলীলাক্রমে যার ছায়া পড়েছে তাঁর আখ্যানে। নারিকেন্দ্রিক যাপনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দুগুলি নির্মাণ করেছেন দার্শনিক চেতনায়। নারীর প্রতিটিরূপ বাস্তবতার মোড়কে নির্মিত হয়েছে। মোহিনীরূপের পাশাপাশি প্রতিবাদী নারীমূর্তির অবয়ব গড়ে তুলেছেন। তাই তাঁর প্রতিটি আখ্যান হয়ে উঠেছে সময়ের জীবন্ত দলিল।

তথ্যসূত্র:

১। অগ্নিহোত্রী, অনিতা। সেরা পঞ্চাশটি গল্প। দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ২৮।
২। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯।
৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।
৪। পূর্বোক্ত পৃ. ১৩৩।
৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২।
৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮।
৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭।
৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬।
৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮।
১০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯।
১১। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২।
১২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭।
১৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০।
১৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৩।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। অগ্নিহোত্রী, অনিতা। এই আধারে কে জাগে। কারিগর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০২০।
২। অগ্নিহোত্রী, অনিতা। দেশের ভিতর দেশ। অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ২০১৩।